মেঘনাদ সাহা, প্রথম জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী

১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে মেঘনাদ সাহার পুত্র অজিত সাহা এক বিজ্ঞান সম্মেলনে ঢাকায় এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'ছাত্রাবস্থায় যখন কোন এক বইতে পড়েছিলাম যে মেঘনাদ সাহাই হলেন আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের জনক তখন খুব ভাল লেগেছিল।' অজিত সাহা বললেন, 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতেই তাঁর কাজকে এভাবে পথিকৃৎ কাজ বলে স্বীকার করা হয়েছে।' বিখ্যাত পদার্থবিদ সি.এন. ইয়ং (C. N. Yang) লিখেছেন যে, তিনি যখন চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করতে যাচ্ছিলেন তখন তার শিক্ষক তাঁকে কলকাতায় মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দেখা করে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাই করেছিলেন।

আসলে মেঘনাদ সাহার নাম সব সময়ই জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের তাপ আয়নকরণ তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকবে। এই তত্ত্ব ব্যবহার করে তিনি তারকার বর্ণালী ব্যাখ্যা করেছিলেন। যে কোন মৌলিক এবং যুগান্তকারী তত্ত্বের মতোই সাহার তত্ত্ব সহজ এবং অবশ্যম্ভাবী। তাপ-বলবিদ্যার আইন মুক্ত ইলেক্ট্রনের গ্যাসের ক্ষেত্রেও যে প্রয়োগ করা সম্ভব এটাই সাহার আবিষ্কার। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও সাহার তত্ত্ব আরো যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল আয়নোস্ফেয়ারের তত্ত্ব, অগ্নিশিখার পরিবাহকতা, ইলেকট্রিক আর্ক ইত্যাদি।

সাহা নিজে নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে। তারকার বর্ণালী, তাপ আয়নকরণ, নির্বাচিত বিকিরণ চাপ, বর্ণালী তত্ত্ব, আণবিক বিশ্লেষণ, আনোস্ফেয়ারে বেতার তরঙ্গের পরিচলন, সূর্যের করোনা, সূর্যের বেতার বিকিরণ, চৌম্বক একমেরু, বিটা, তেজস্ক্রিয়তা এবং শিলার বয়স।

শিক্ষক হিসেবে সাহা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এবং প্রেরণাদানকারী। তিনি কলকাতা এবং এলাহাবাদে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় দুটি সক্রিয় কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কলকাতায় তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ইনস্টিটিউ অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, যা এখন সাহা ইনিস্টিটিউট নামে খ্যাত। ভারতে একাডেমি অব সায়েন্স সংগঠন গড়ে তোলার মূল কৃতিত্ব তাঁরই যদিও এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সি ভি রামনের যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়েছিল। তিনি বহুকাল যাবৎ 'সায়েন্স এন্ড কালচার' নামে একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত সরকার 'কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা করলে সাহা প্রথম থেকেই তার সদস্য ছিলেন। এই কাউন্সিলের ভারতীয় বর্ষপঞ্জি সংস্কার কমিটির তিনি চেয়রম্যান ছিলেন। তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের একজন নির্বাচিত স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে তিনি মৌলবাদী হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কিছুটা জড়িত ছিলেন বলে শোনা যায়। জাতীয় পরিকল্পনার কাজে তাঁর আগ্রহ ছিল

অপরিসীম, বিশেষকরে বিজ্ঞান এবং শিল্পায়নের ব্যাপারে। ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে মেঘনাদ সাহা প্রথম থেকেই তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীর এই পরিকল্পনা কমিশনের দফতরে যাওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাষট্টি বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মেঘনাদ সাহার জন্ম বাংলাদেশে। ঢাকার অদূরে শ্যাওরাতলী গ্রামে ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ সাহা এবং ভুবনেশ্বরী দেবীর আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। একটা ছোট মুদীর দোকানের আয়ে যে সংসার চলত তাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া সহজ ছিল না। গ্রামে কোন হাই স্কুলও ছিল না। সাত মাইল দূরের একটি ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় একজন চিকিৎসক অনন্ত কুমার দাসের বদান্যতায় তিনি ঐ স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর বাসায় থেকেই তিনি লেখাপড়া করেছেন। ১৯০৫ সালে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। এই বছর বাংলা প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় এবং ঐ স্কুলেও সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। বাংলার গভর্নর ঐ স্কুল পরিদর্শনে এলে ছাত্ররা ধর্মঘট করে এবং এরই পরিণামে সাহা তাঁর সরকারি বৃত্তি হারান। সুতরাং বাধ্য হয়ে সাহাকে বেসরকারি কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে ভর্তি হতে হয় এবং এখান থেকেই তিনি পূর্ববঙ্গের সব পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হয়ে ১৯০৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯১১ সালে সাহা ঢাকা কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি. পাশ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।

এরপর সাহা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন সত্যেন বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞান মুখার্জি এবং জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তাঁর এক বছরের বড় ছিলেন, নিখিলরতন ধর দু'বছরের। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন রসায়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু, গণিতে ডি.এন. মল্লিক এবং সি.ই. কালিস। ১৯১৩ সালে গণিতে সম্মানসহ বি.এসসি. পরীক্ষায় এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে এম.এসসি. পরীক্ষায় সাহা হয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়, প্রথম হয়েছিলেন সত্যেন বসু।

এক সময়ে সাহা ইন্ডিয়ান ফিনান্স সার্ভিসে যোগ দেয়ার জন্য পরীক্ষা দেয়ার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সরকারের অনুমতি মেলেনি। সাহা ফলিত গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করতে মনস্থির করে ফেললেন। তাঁর এবং তাঁর ছোট ভাইয়ের জীবনধারণের জন্য এ সময় তাঁকে প্রাইভেট টিউশানি করতে হয়েছে— সাইকেলে করে তাঁকে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৈনিক যাতায়াত করতে হয়েছে। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জাস্টিস আশুতোষ মুখার্জির প্রচেষ্টায় একটি ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা এবং গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি। তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ নামক দু'জন আইনবিদের বদান্যতায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন বসু গণিত বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯১৭ সালে তাঁরা দু'জনেই সৌভাগ্যক্রমে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন। কিছুদিন পরে সি.ভি. রামন এই বিভাগে পালিত অধ্যাপক হয়ে আসেন।

১৯১৯ সালে এই বিভাগে যোগ দেন ডি.এম. বসু যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বার্লিনে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন,

'পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে আমার দু'জন সহকর্মী ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং এস.এন. বসু। জার্মানিতে, বিশেষকরে বার্লিনে এ সময় পদার্থবিজ্ঞানে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানতেন না। এ সময়ে বার্লিনে সমবেত হয়েছিলেন প্ল্যাংক, আইনস্টাইন, ভারবুর্গ, ম্যাক্স বর্ন, ওয়াল্টার নারনস্ট-এর মতো বিজ্ঞানীরা— যাঁরা কোয়ান্টাম এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁরা তখন এসব তত্ত্বের তাত্ত্বিক অগ্রগতি এবং পরীক্ষণভিত্তিক যাচাইকরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আমি আমার এই দু'জন সহকর্মীর বৈশিষ্ট্য মনে করতে পারি, যা তাঁদের বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। এস.এন. বসুকে আমি প্ল্যাংকের দুটি বই 'থার্মোডিনামিক' এবং 'ভার্মেস্ট্রাহলুং' পড়তে দেই যা এ সময়ে এদেশে পাওয়া যেত না। এস.এন বসু অল্পসংখ্যক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্ল্যাংক যৌক্তিক পদ্ধতিতে যেভাবে সমগ্র তাপবলবিদ্যা নির্ধারণ করেছিলেন তার প্রশংসা করতেন। কিন্তু অন্যদিকে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সংক্রান্ত বর্ণালী শক্তি বন্টনের আইন চিরায়ত বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ত্ব এবং তাপবলবিদ্যার

ভিত্তিতেই করা হয়েছিল যার সঙ্গে শুধু কোয়ান্টাম অনুসিদ্ধান্ত জুড়ে দেয়া হয়েছিল। এস.এন. বসু প্ল্যাংকের এই উপস্থাপনার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ধরতে পেরেছিলেন এবং প্ল্যাংকের 'থার্মোডিনামিকে'র যে বৈশিষ্ট্য সেই পরিষ্কার যৌক্তিক নির্ধারণের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। প্ল্যাংকের বিকিরণ সমীকরণের নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর এই বৌদ্ধিক অস্বাচ্ছন্দ্য থেকেই আমার মনে হয় বসু ১৯১৫ সালে প্ল্যাংকের সমীকরণের একটি সমাহার-গণিতভিত্তিক নির্ধারণ দিতে পেরেছিলেন।

'মেঘনাদ সাহার গবেষণার ধরন ছিল সরাসরি। তিনি আমার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার দিগন্তে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে চাইতেন বিশেষ করে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান এবং তাপবলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার। কোন কোন সময়ে তিনি আমার সঙ্গে গ্যাসের তাপ আয়নকরণ তত্ত্ব এবং তারকার বর্ণালী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করতেন।'

১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেঘনাদ সাহাকে তাঁর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব এবং বিকিরণ-চাপের ওপর কাজের ভিত্তিতে ডি.এসসি. ডিগ্রি প্রদান করেন। অন্যদিকে সত্যেন বসু জীবনে এম.এ. ছাড়া অন্য কোন ডিগ্রি পাননি। এ সময় পর্যন্ত সাহার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা দশটি যার সবগুলিকেই খুব উল্লেখযোগ্য কাজ বলা যায় না। কিন্তু স্পষ্টতই সাহা বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার মূল্য বুঝতেন। তাঁকে এ সময় প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিও দেয়া হয় এবং ১৯২০ সালে সাহা এক বছরের জন্য ইংল্যান্ড ও জার্মানি যাওয়ারও সুযোগ পেয়েছিলেন।

মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান আগেই বলা হয়েছে— উচ্চ তাপমাত্রায় আয়নকরণ তত্ত্ব এবং তারকার আবহাওয়া পমিণ্ডলে তার প্রয়োগ। আজকাল যা সাহা সমীকরণ নামে পরিচিত, তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসের ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, 'অন আয়োনাইজেশন ইন দি সোলার ক্রোমোস্ফেয়ার' বা সূর্যের বর্ণগোলার্ধে আয়নকরণ। ভৌত রসায়নের ভাষা ব্যবহার করে সাহা তাঁর সমীকরণকে বলেছিলেন 'আয়নকরণের জন্য বিক্রিয়া-সমচাপের সমকিরণ।'

ধরা যাক, আমরা ক্যালসিয়াম পরমাণুর কথা চিন্তা করছি। এই পরমাণু ভেঙে ক্যালসিয়াম আয়ন এবং ইলেক্ট্রন তৈরি হয়।

ক্যালসিয়াম পরমাণু ↔ ক্যালসিয়াম আয়ন + ইলেক্ট্রন + নিঃসৃত শক্তি

$Ca \leftrightarrow Ca+ + e + U$

ধার যাক, এক গ্রাম এটম ক্যালসিয়াম পরমাণুর x ভগ্নাংশ আয়নায়িত হয় যার চাপ p এবং তাপমাত্রা T; তাহলে দেখানো যায় যে, এটাই সাহার বিখ্যাত সমীকরণ।

সাহার এই তাপ আয়নকরণের তত্ত্ব জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করে, কেননা এই প্রথম তাপবলবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর তারকার বর্ণালী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল। এই ব্যাখ্যায় শুধু প্রয়োজন তারকার আবহাওয়ামণ্ডলের ভৌত অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্যের। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি সাহার সমীকরণ দিয়ে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

সাহা তাঁর তত্ত্বে কিভাবে উপনীত হয়েছিলেন তা তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়। তিনি লিখেছেন,

'জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার সময়ে এবং এম.এসসি. শ্রেণীতে তাপবলবিদ্যা ও বর্ণালীতত্ত্ব পড়াবার সময় ১৯১৯ সালের দিকে তাপ আয়নকরণের তত্ত্ব আমার মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। আমি জার্মান জার্নাল নিয়মিত পড়তাম এবং সেভাবেই জে. এগার্টের একটি প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হই— যেখানে তিনি নারনস্ট-এর তাপ-উপপাদ্য প্রয়োগ করে তারকায় উচ্চ তাপমাত্রায় বিপুল আয়নকরণ ব্যাখ্যা করেছিলেন---।

নারনস্ট-এর ছাত্র এবং ঐ সময়ের সহকারী এগার্ট তাপ আয়নকরণের একটি সমীকরণ দিয়েছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি পরমাণুর আয়নকরণ বিভবের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। এই বিভবের গুরত্ব এই সময়ে বোরের তাত্ত্বিক কাজ এবং প্ল্যাংক ও হার্থসের পরক্ষিণলব্ধ কাজের ফলে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

এগার্টের প্রবন্ধটি পড়ার সময় আমি তাঁর সমীকরণে আয়নকরণ বিভবের মান অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, যা দিয়ে যে কোন পাদর্থের যে কোন তাপ এবং চাপের এক অথবা বহু আয়নকরণ নিখুঁতভাবে গণনা করা যায়।

এভাবেই আমার নামে যে সমীকরণটি এখন পরিচিত তা আমি পেয়েছিলাম। সূর্যের ক্রোমোস্ফেয়ারের সমস্যা সম্বন্ধে আমি আগেই পরিচিত ছিলাম। সুতরাং আমার সমীকরণ সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) আমি চারটি প্রবন্ধ রচনা করে ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

এ সময়েই সাহা লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে প্রফেসর এ. ফাউলারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অধ্যাপক ফাউলারের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ফাউলারের অগাধ জ্ঞান এবং তাঁর সঞ্চিত নানা তথ্য ব্যবহার করে সাহা তাঁর প্রবন্ধের উন্নতি করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ সময় সাহা ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন, নেচার, প্রসিডিংস অব রয়াল সোসাইটি জার্নালে যে চার-পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলা যায়। তাঁর এর পরের চৌম্বক একমেরু সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটিকে একই রকমভাবে উল্লেখযোগ্য বলা যায়।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে সাহা ইউরোপ থেকে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং দু'বছর পরে তিনি এলাহাবাদ বিশ্বদ্যিালয়ে অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। এখানে তিনি পনের বছর ছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিল ডি.এস. কোঠারি, আর.সি. মজুমদার, পি.কে. কিচলু, জি.আর. টোসনিওয়াল, বি.এন. শ্রীবাস্তব, এ. এন. চ্যান্ডন এবং আরো অনেকে।

১৯২৬ সালে মেঘনাদ সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিত শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে সাহা এবং ডি.এম. বসু ইতালির কোমো শহরে ভোল্টা শতবার্ষিকী উৎসবে আমান্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। উল্লেখ করা যায়

যে, এই সম্মেলনেই নীলস বোর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দার্শনিক পটভূমি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা এই বিষয়ের ওপর একটি মাইল ফলক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সাহা বা ডি.এম. বসুর কোন লেখায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাহাকে পালিত অধ্যাপক পদে নিয়োগদান করেন। এই পদে সি.ভি. রামন এবং ডি.এম. বসু এক সময় কাজ করেছেন এবং সাহাও এ পদে কাজ করেলিন প্রায় পনের বছর। এ সময় তিনি প্রশাসনিক কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকতেন এবং ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (পরে সাহা ইনস্টিটিউট) সংগঠনের কাজেও তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হত। আরো একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁর শক্তি এবং সময় দিতে হত, সেটি হল মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'। ১৯২৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণাগার থেকেই রামন এবং কৃষ্ণান রামন-প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠানে ডিরেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হয়, যার প্রথম অধিকারী ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তিনি ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অবৈতনিক ডিরক্টর ছিলেন।

১৯৩৪ সালের মোম্বাই বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি ছিলেন মেঘনাদ সাহা। তাঁর ভাষণের প্রথম অংশে ছিল জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে তিনি একটি 'সর্বভারতীয় একাডেমি অব সায়েন্সেস' গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। এই ভাষণেই তিনি বন্যা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং একটি নদী গবেষণাগার স্থাপনের কথা বলেছিলেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর পানি ব্যবহারের তাঁর প্রস্তাব থেকেই পরবর্তীকালে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের সৃষ্টি হয়।

মেঘনাদ সাহার জীবন এবং গবেষণা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কেননা যে কোন বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের ব্যাপারে তাঁর উপদেশ এবং সহযোগিতা ছিল প্রকল্পের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত। বিজ্ঞানের প্রতি মেঘনাদ সাহার অঙ্গীকার ছিল প্রবাদ বাক্যস্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা সব সময়ই অণুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর নিজের কথায় বলা যায়,

'আমাদের সতীর্থদের প্রতি দয়া এবং সেবার আদর্শ সব মহান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারাই বলে গিয়েছেন এবং সন্দেহ নেই কোন কোন মহান রাজা এবং মন্ত্রী এই দর্শন বাস্তবায়নের চেষ্টাও সব সময় এবং সব দেশেই করেছেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সফল হয়নি শুধু এই সহজ কারণে যে, উৎপাদনের ব্যবস্থা সকলের জন্য প্রাচুর্য সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না যা কার্যকরী জনহিতের একমাত্র শর্ত। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের জীবনের জন্য বিজ্ঞান সেই লক্ষ্য অর্জন করেছে যা পৃথিবীর সব ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ঐতিহাসিক কারণে সম্পদের অসম বিন্যাস আজ সামাজিক আইন প্রবর্তনের ফলে দ্রুত দূর করা সম্ভব হচ্ছে।'

বাংলাইন্টারনেট.কম